# ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবি কতটা যৌক্তিক

হাসান ফেরদৌস

১৩ নভেম্বর ২০১৯, ১৩:০০
আপডেট: ১৩ নভেম্বর ২০১৯, ১৩:০৬

ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবি সমর্থন করেন এমন অনেকের যুক্তি, ছাত্রদের কাজ লেখাপড়া করা, রাজনীতি করা নয়। উদাহরণ হিসেবে এঁরা আমেরিকার কথা বলে থাকেন। এঁদের ধারণা, আমেরিকায় শিক্ষার মান উন্নত, কারণ, সেখানে ছাত্ররাজনীতি নেই।

ভুল, আমেরিকায় আগেও ছাত্ররাজনীতি ছিল, এখনো আছে। শুধু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, এখানে স্কুল পর্যায়েও ‘স্টুডেন্ট গভর্নমেন্ট’ রয়েছে, যার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা দেশের প্রধান রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোতে বিতর্কের পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। এমনকি কোন খাতে কীভাবে অর্থ ব্যয় হবে, সে ব্যাপারেও কোনো কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নাক গলাতে পারে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোরও ক্যাম্পাসে নিজেদের ছাত্রসংগঠন আছে। যেমন কলেজ ডেমোক্র্যাটস অব আমেরিকা। আমেরিকার কেন্দ্রীয় ডেমোক্রেটিক পার্টির

সঙ্গে সংযুক্ত এই ছাত্রসংগঠনের সদস্যসংখ্যা এক লাখেরও বেশি। অন্য প্রধান দল রিপাবলিকান পার্টিরও আছে একই রকম ছাত্রসংগঠন।

জাতীয় রাজনীতির মতো ক্যাম্পাসেও ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান ছাত্রসংগঠনের লাঠালাঠি কম নয়। কখনো কখনো এই লাঠালাঠি সামলাতে পুলিশ পর্যন্ত ডাকতে হয়। সব সময় যে গণতান্ত্রিক নীতিবোধ মেনে ছাত্রদের রাজনৈতিক বিরোধ প্রকাশিত হয়, তা নয়। যে ক্যাম্পাসে যার জোর বেশি, সেখানে তাদের রাজনৈতিক মতবাদ প্রাধান্য পায়। উদারনৈতিক বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাম্প সমর্থকদের স্থান নেই। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর শ্বেত শ্রেষ্ঠত্ববাদী হিসেবে পরিচিত রিচার্ড স্পেনসার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপাবলিকান ছাত্রদের আমন্ত্রণে ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু টুঁ শব্দটি করার আগেই তাঁকে প্রতিবাদের মুখে স্থান ত্যাগ করতে হয়। আবার অতি রক্ষণশীল লিবার্টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাম্পবিরোধী লেখক জনাথন মার্টিনকে অধ্যক্ষের নির্দেশে ক্যাম্পাস পুলিশ দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। ইউনিভার্সিটি অব আলাবামাতে ট্রাম্প সমর্থকদের দাপট এত প্রবল যে তাঁরা সম্প্রতি হুমকি দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলার সময় যদি কেউ ট্রাম্পবিরোধী স্লোগান দেয়, তাহলে তাদের খেলার মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হবে।

অধিকাংশ ক্যাম্পাসে উদারনৈতিক ও অতি বামপন্থী ছাত্রদের প্রাধান্য। এদের প্রভাবেই শিক্ষার্থীরা যুদ্ধবিরোধী বা আগ্নেয়াস্ত্রবিরোধী রাজনীতির কেন্দ্রে। শুধু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নয়, হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও এই আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠ। ফ্লোরিডার একটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নেতৃত্বে আগ্নেয়াস্ত্রবিরোধী ‘মার্চ ফর আওয়ার লাইভস’ এখন এ দেশের মূলধারার রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এই আন্দোলনের সমর্থকেরা জানিয়েছেন, ছাত্র-তরুণেরা শুধু জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ের নির্বাচনে সেই সব প্রার্থীদের সমর্থন করবেন, যাঁরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের পক্ষে। একই অবস্থান জলবায়ু পরিবর্তন প্রশ্নেও।

শিক্ষার্থীদের এই রাজনৈতিক অবস্থান চলতি ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য এতটা ভীতিকর যে তারা বিভিন্ন প্রশাসনিক নির্দেশের মাধ্যমে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের ভূমিকা সংকোচনের পথ খুঁজছে। তারা ‘ফ্রি স্পিচের’ নামে দাবি তুলেছে, যেসব ছাত্র অথবা ছাত্রসংগঠন ভিন্নমত অর্থাৎ রিপাবলিকান মতবাদ প্রচারে বাধা দেবে, তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে

বহিষ্কার করা হবে। সরকারি আর্থিক সাহায্য পায় এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর এই নতুন নীতিমালা কঠোরভাবে প্রয়োগের জন্য অ্যারিজোনা, জর্জিয়া ও নর্থ ক্যারোলাইনার রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত আইন পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজে হুমকি দিয়েছেন, 'ফ্রি স্পিচে' বাধা দেওয়া হলে সরকারি অনুদান বন্ধের জন্য তিনি

নিজের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। যাতে এই সব কঠোর নীতিমালা কার্যকর হয়, সে জন্য বিভিন্ন রক্ষণশীল জাতীয় সংগঠন রাজনৈতিক ক্যাম্পেইন শুরু করেছে, তার জন্য দেদার অর্থ ব্যয়েও কোনো দ্বিধা নেই তাদের।

অন্য কথায়, যা ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সমস্যা, তা ক্রমেই জাতীয় রাজনীতির অবিভাজ্য অংশ হয়ে পড়েছে।

বাম ও ডানের এই পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়ে তীব্র বাদ-বিবাদ রয়েছে, কিন্তু ক্যাম্পাসে রাজনীতি বা রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হোক, এমন দাবি কোনো পক্ষ থেকেই করা হয়নি। সব পক্ষই মনে করে, যাঁরা আগামী দিনের 'নেতা' হবেন, তা রাজনীতি হোক, বিজ্ঞান বা কূটনীতি অথবা অন্য যেকোনো ক্ষেত্র হোক, তাঁদের প্রশিক্ষণের শ্রেষ্ঠ জায়গা হলো শিক্ষাক্ষেত্র।

এ কথা আমেরিকায় যেমন সত্য, বাংলাদেশেও তেমনই সত্য। বস্তুত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অধিক সত্য। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি শুরু ছাত্র বয়সে, স্কুলে থাকতেই তিনি উপনিবেশবিরোধী রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের শুরু ১৯৪৮ সালে. জিন্নাহর উর্দুর পক্ষে সাফাইয়ের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। তাতেও ছাত্ররাই নেতৃত্ব

দেন।

কিন্তু তারপরও ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার যে দাবি উঠেছে, তার প্রাসঙ্গিকতা এককথায় নস্যাৎ করাও সম্ভব নয়। সম্প্রতি বুয়েট কর্তৃপক্ষ ওই ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে; শিক্ষকদেরও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে। ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। কোনো কোনো সাবেক ছাত্রনেতা এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয়, জনমত যাচাই করলে দেশের অধিকাংশ মানুষই এই দাবি সমর্থন করবে।

এটা স্বীকার করেও আমার মনে হয় ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব শুধু নাগরিক অধিকারবিরোধী নয়, নির্বুদ্ধিতাও। আজ সহিংসতার কারণে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা হলে দুদিন পর একই কারণে শ্রমিকদের রাজনীতিও বন্ধ করা হতে পারে। 'ক্ষতিকর' বিবেচনায় পরিবেশবাদী বা নারী অধিকার সংগঠনের কার্যকলাপও নিষিদ্ধ হতে পারে। ইতিহাসের পাঠ থেকে আমরা জানি, নির্বাচিতভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধের ভেতর দিয়েই শুরু হয় ফ্যাসিবাদ।

ছাত্রদের ক্ষেত্রে সমস্যা রাজনীতি নয়। সমস্যার কেন্দ্রে ক্যাম্পাসে ছাত্রসংগঠনের নামে জাতীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর অবাধ অনুপ্রবেশ। নামে ছাত্রসংগঠন হলেও বাংলাদেশে কোনো ছাত্রসংগঠন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো থেকে বিযুক্ত নয়। বস্তুত তারা প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাম্পাস রাজনীতির সঙ্গে বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির এটাই প্রধান ভিন্নতা। ছাত্ররাই যদি সব প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, তাহলে অবস্থা ভিন্ন হতো। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, বাংলাদেশে ছাত্রসংগঠনের নীতি ও নেতৃত্বের প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে 'বড় ভাইদের' হাতে। অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্রনেতা ও তাঁদের সমর্থকেরা কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের লাঠিয়ালের দায়িত্ব পালন করেন। এঁদের সম্পর্কটা যেন মালিক-প্রভু বা পেট্রন-ক্লায়েন্টের মতো। আনুগত্যের তোফা হিসেবে সময়-সময় আলুটা-মুলাটা-ঠিকাদারির কনট্রাক্টটা ছাত্রনেতাদের কপালে জোটে। শুধু ছাত্র কেন, রাজনৈতিক দলগুলোর অন্য সব অঙ্গসংগঠনের সম্পর্কের চরিত্রই এ রকম।

বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতি যে এত সহিংস ও ছাত্রকল্যাণবিরোধী, তার কেন্দ্রে রয়েছে এই আন্তসম্পর্ক। প্রধান

রাজনৈতিক দলগুলো রাস্তায় একে অপরের বিরুদ্ধে ভাঙচুর করায়। ক্যাম্পাসেও তাদের লেজুড়দের একই কাণ্ড করতে দেখি। প্রধান দলগুলোয় গণতান্ত্রিক চর্চা নেই, ছাত্রসংগঠনেও নেই। বছরের পর বছর একই লোকেরা নেতৃত্বে থাকেন। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ক্ষমতার দাপট ও বল প্রয়োগের নীতিতে চলে। ছাত্রসংগঠনও ব্যতিক্রম নয়। ভিন্নমত দমনে উভয়ের জন্যই ভীতি একটি মস্ত হাতিয়ার, যার নির্মম শিকার হতে হয় আবরারের মতো নিরীহ ছাত্রকে।

এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বুয়েট ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এটি সমস্যার সমাধান হতে পারে না। শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার হরণ করে অসুস্থ রাজনীতি থেকে শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত রাখা যাবে না। এর জন্য যা প্রয়োজন ক্যাম্পাসের ভেতরে ও বাইরে ছাত্রসংগঠনকে ‘বড় ভাইদের’ রাজনীতি থেকে বিযুক্ত করা।

**হাসান ফেরদৌস** প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক